রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০১ বৈশাখ ১৪১৯
১৪ এপ্রিল ২০১২

বাণী

আজ পহেলা বৈশাখ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ। শুভ নববর্ষ। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে আমি দেশবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

বছর ঘুরে বাংলা নববর্ষ বাঙালির জীবনে সমাগত এক অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে। এটি চিরায়ত বাংলার বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যে লালিত এক অনন্য দিন। বাঙালির সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভূতি বিমূর্ত হয়ে ওঠে এদিনে। পুরানোকে পেছনে ফেলে নব উদ্যমে নতুনকে বরণ করে নেয় গোটা বাঙালি সমাজ। মেতে ওঠে অনাবিল আনন্দে। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, কৃষি-ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি আয়োজনে বাংলা মাস ও তারিখের ভূমিকা চিরন্তন। আবহমানকাল ধরে তাই বাঙালি সমাজে বাংলা নববর্ষের আবেদন সার্বজনীন। অতীতের বিভেদ ভুলে বাংলা নববর্ষ সবাইকে সুন্দর আগামী গড়ার প্রত্যয়ে অনুপ্রাণিত করুক–এটাই আমার প্রত্যাশা। কবি গুরুর ভাষায় বলি:

'ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহো আরবার চিরপুরাতন মোরে।'

বাংলা নববর্ষ ১৪১৯ সবার জন্য শুভ ও কল্যাণকর হোক।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

আবুল কালাম আজাদ, এমপি
মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'এলো নববর্ষ এলো আজ
রৌদ্রদগ্ধ দূর দিগন্ত বলছে আজ।
এলো নববর্ষ পুষ্প পিবিড় এই উদ্যান বলছে আজ।'

বৈশাখ সৃষ্টি করে এক নতুন আবহ। বৈশাখ মানে পুরাতন জরাজীর্ণতাকে পেছনে ফেলে নবীনতাকে জাগরিত করার ডাক। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে স্বতন্ত্র মহিমায় পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ আজ আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে সর্ববৃহৎ উৎসবে পরিণত হয়েছে।

ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, সকল পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে আমরা নববর্ষকে বরণ করি, বর্ষবরণ উৎসবে মেতে উঠি। ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর প্রীতি, সৌহার্দ্য, আনন্দময়তা আর শুভময়তায় পূর্ণ এই উৎসব। পৃথিবীব্যাপী সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ও জাতিগত সংহতি রচনায় এই উৎসব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলা নববর্ষ পালনের ইতিহাস সুপ্রাচীন। বাংলাদেশ সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দেশ। বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষাভাষী ও নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ এই উৎসবকে আপন ঐতিহ্যে পালন করছে যুগ যুগ ধরে। বৈশাখ এলেই মনে আসে আমাদের লোকজ হালখাতা, বৈশাখী মেলা, মেলায় যাত্রা, পুতুল নাচ, নাগরদোলা ইত্যাদি। বাঁশির সুরে আর ঢাকের শুভ শব্দে বৈশাখকে স্বাগত জানাবার কথা। যা কিছু অশুভ, জীর্ণ, মলিন তা পেছনে ফেলে সামনের স্বর্ণালি দিনের দিকে এগিয়ে যাবার কথা।

'এসো এসো ওগো নবীন,
চলে গেছে জীর্ণ মলিন—
আজকে তুমি মৃত্যুবিহীন
মুক্ত সীমারেখা।'

শুভযাত্রা সাংস্কৃতিক দিক থেকেই নয় [illegible] গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও নববর্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই উৎসব ঐতিহ্যের দিকে ফিরে তাকাবার উৎসব। বৈশাখের মূল কথা হোক–সকল মানুষের শুভকামনার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ আগামীর আবাহন। নতুন বছরের আগমন সবার জন্য আনন্দময় হোক।

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল কালাম আজাদ

বাংলা নববর্ষ উৎসব : উদ্ভব, নবআঙ্গিকে নগরবিজয় এবং উৎসে ফেরা

শামসুজ্জামান খান

সূচনাপর্বের তত্ত্ব-তালাশ সেই কোন ধূসর অতীতে বাঙালির নববর্ষ উৎসব শুরু হয়েছিল গ্রামীণ বাংলাদেশের নিস্তরঙ্গ পরিবেশে; ক্ষুদ্র আয়োজনে পারিবারিক বা গোষ্ঠীগতভাবে। এই আয়োজন ছিল আঞ্চলিক। এর কিছু উদাহরণ পেশ করি। বাঙালি কৃষকের পারিবারিক উৎসবের নাম ছিল 'আমানি'। ড. মুহম্মদ এনামুল হক 'আমানি' শব্দটির উদ্ভব নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'আমানি' শব্দটি আমপানীয় অথবা অন্নপানীয়–এই দুই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করে থাকবে। শব্দ দুটির বিবর্তনের ধারা নিম্নরূপ :
আমপানীয় > আমআনিঅ > আমানি; অর্থাৎ অসিদ্ধ (আম) চাউলজাত জল।
অন্নপানীয় > অন্নআনিঅ > আমআনি > আমানি; অর্থাৎ সিদ্ধ চাউলজাত টক পানীয়; পান্তাভাতের পানি, কাঁজি।
এক্ষেত্রে আমাদের 'নববর্ষের' 'আমানির' অর্থে প্রথম শব্দটি (আমপানীয়) প্রযোজ্য। এটা আদিমতম রীতির পরিচায়ক। দ্বিতীয় শব্দটি সভ্যতার পরবর্তী স্তরের। এই স্তরে মানুষ রান্না করতে ও তাকে সঞ্চয় করে রেখে বাসি করে খেতে শিখেছে। সভ্যতার এ স্তরে আমাদের দেশের মানুষ 'আমানি' বা 'কাঁজি' বা পান্তাভাত খেয়েও নববর্ষের উৎসবে যোগ দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং শব্দটির দুই ব্যুৎপত্তিই গ্রাহ্য বলে মনে হয়।

জীবনযাত্রার প্রয়োজন ও বিনোদন নববর্ষের প্রথম দিন দরিদ্র, মেহনতি ও ঐতিহ্যপ্রেমিক বাঙালির জীবনে একটি উৎসব-আনন্দের ছোঁয়া যেমন দিয়ে যায়, তেমনি তাদের মধ্যে সারাবছরের প্রয়োজনের উপকরণ সংগ্রহ করে রাখারও একটি তাগিদ সৃষ্টি করে। আর এই দুই প্রয়োজনই মিটিয়ে এসেছে গ্রামবাংলার নানারকম বৈশাখীমেলা। মেলা ছিল চৈত্রসংক্রান্তি বা ১লা বৈশাখের সর্বজনীন উৎসব। সেকালের প্রায় নিশ্চল, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগহীন গ্রামীণ বাংলাদেশের মানুষের সাংবাৎসরিক প্রয়োজন মেটানো এবং শখের জিনিস কেনাকাটার একমাত্র জায়গা ছিল মেলা। আবার বন্ধুবান্ধব, চেনাজানা লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ মিলনের স্থানও ওই মেলা। আর মনের আনন্দ ও বিপুল মানুষের চিত্তরঞ্জনের জায়গাও ওই মেলা। কৃষ্ণলীলা, রামযাত্রা, বেহুলার ভাসান যাত্রা, জারি-সারি-মুর্শিদি, পুতুল নাচ, সার্কাস নাগরদোলা ইত্যাদির আয়োজনে প্রাণবন্ত বাংলার মেলা। আমানি যেমন লুপ্ত লোকাচার–মেলা তেমন নয়। এর সঙ্গে বাস্তব জীবনযাত্রার প্রয়োজন ও বিনোদনের সম্পর্ক আছে বলেই মেলার ফাংশন চুকেবুকে যায়নি। নতুন আর্থসামাজিক অবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হওয়ার কারণে বর্তমানে মেলা-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ বিস্তার ও নববিন্যাস ঘটেছে।

গ্রামীণ মেলা সুপ্রাচীন নববর্ষের অনুষঙ্গী আয়োজন। নববর্ষ উৎসবের সঙ্গে এর সম্পর্ক এখনও বিযুক্ত হয়নি। বরং নববর্ষ অনুষ্ঠানকে বৈচিত্র্যময় ও বর্ণাঢ্য করে তুলেছে গ্রামগঞ্জের এবং নাগরিক বৈশাখীমেলা। সাবেক কালের বৈশাখীমেলার সঙ্গে কৃষি অর্থনীতির যোগ ছিল। এখনকার মেলা মূল অর্থনীতির সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে। মেলার জন্য তৈরি করা হয় তাঁতের শাড়ি, পাঞ্জাবি, নকশিকাঁথা, শতরঞ্জি, পুতুল, মাটির কাজসহ নানা উপকরণ। এখন এসব উপকরণ নন-ট্রাডিশনাল আইটেম হিসেবে বিদেশে রপ্তানি হয়ে বৈদেশিক মুদ্রাও আয় করছে।

বছরের হিসাব-নিকাশ চুকানোর আনুষ্ঠানিকতা বাংলা নববর্ষ উৎসবের আরেক আনুষ্ঠানিকতা হালখাতা উৎসব। এককালে গ্রামবাংলা এবং শহর অঞ্চলেও এ অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপন করা হতো। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল নববর্ষের এক সর্বজনীন ও তাৎপর্যপূর্ণ আয়োজন। শুধু অর্থনৈতিক অনুষ্ঠান বলেই এর গুরুত্ব বেশি ছিল তা নয়। এর সামাজিক গুরুত্বও ছিল অনেক। যিনি নববর্ষের হালখাতার দিনে দোকানে বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে বকেয়া পরিশোধ করে হিসাব হালনাগাদ করতে পারতেন তিনি শুধু দোকান বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে গিয়ে মিষ্টিমুখ করেই ফিরতেন না– আত্মমর্যাদা ও গর্ব নিয়েও ফিরতেন। আর যিনি এই বকেয়া শোধ করতে অপারগ হতেন তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতো এবং তাকে লোকসমক্ষে ম্রিয়মাণ হয়ে থাকতে হতো।

'হালখাতা' এখন সেই উৎসবমুখর ব্যাপকতা হারিয়েছে। এর কারণ কৃষি-অর্থনীতি থেকে আমাদের পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী অর্থনীতিতে প্রবেশ। সাবেক কালে গ্রামবাংলার ব্যাপক কৃষিজীবী সমাজের হাতে নগদ টাকার অভাব ছিল। ফসলের মৌসুমে, বিশেষ করে পাট বিক্রি করেই কৃষকরা নগদ পয়সার মুখ দেখতেন। [illegible] দৈনন্দিন সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন। পাট বিক্রির টাকাতে [illegible] অর্থনীতিতে [illegible] পয়সা। এমতাবস্থায় গ্রামবাংলায়ও বাকিতে বিক্রির নেই বিশাল ব্যাপকতা। তাই হালখাতাও জৌলুস হারিয়েছে। হালখাতা এখনও হয় বটে, কিন্তু তা খুব সাদামাটা এবং কিছু তাৎপর্যহীনও।

বাংলা সন ও তার সংস্কৃতি : সমকালীন গ্রামীণ প্রেক্ষাপট আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও গ্রামীণ বাংলাদেশে বাংলা সনের ব্যবহারিক, ঐতিহ্যগত ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ছিল সর্বব্যাপী। বাংলা সন ফসলি সন। আমাদের দেশ কৃষিভিত্তিক, তাই ফসলি সন হিসেবে বাংলা সনের সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক নিগূঢ়। অর্থাৎ উপরিতল বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গেই নয়, একেবারে ভিত্তিমূল তথা উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গেই ছিল বাংলা সনের ওতপ্রোত সম্পর্ক। সেজন্যই গ্রামবাংলায় বাংলা সনের এত গভীর ও ব্যাপক প্রভাব ছিল। বিপুল কৃষক সমাজ তাদের দৈনন্দিন, সাংসারিক ও উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ড যথা বিয়ে-শাদি, উৎসব-পার্বণ, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি এবং ফসল বোনা, ফসলের পরিচর্যা, ফসল কাটা প্রভৃতি সকল কাজই বাংলা সন-তারিখ অনুযায়ী সম্পন্ন করতেন। তাছাড়া জমিদারদের পুণ্যাহ অনুষ্ঠান যেমন বাংলা সনের প্রথম দিন হতো, তেমনি জমিদারির কাজকর্ম, কাগজপত্র রক্ষা, খাজনার রসিদপত্র সবই করা হতো বাংলা সন-তারিখ অনুযায়ী। বোধহয় মুগল আমলের শেষদিক থেকে ইংরেজ আমল হয়ে পাকিস্তান আমলের প্রথমদিক পর্যন্ত বাংলা সন তারিখের এ ব্যাপক ব্যবহার অব্যাহত ছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, গ্রামবাংলার অর্থকরী, উৎপাদনমূলক এবং প্রজা ও জমিদার বা সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত কৃষি, খাজনা, জমি বেচাকেনার দলিল অর্থাৎ আর্থিক, আইনগত সংযোগ ও কার্যাদি বাংলা ভাষায় এবং বাংলা সন অনুযায়ীই হতো। অতএব, বাঙালি কৃষকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ন্ত্রক ভূমিকায় ছিল এই সন।

এখন কিন্তু এ অবস্থায় অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। গ্রামবাংলায় বাংলা সনের সেই একক ও নিরঙ্কুশ আধিপত্য আর নেই। এখন গ্রামীণ মানুষের আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটছে। কৃষকের সন্তানরা অধিক হারে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে, মেয়েরাও আছে এর মধ্যে। অনেকের বাড়িতে আসছে রেডিও, টেলিভিশন, সেলফোন, আধুনিক আসবাব ও তৈজসপত্র। ফলে বদলে যাচ্ছে জীবনযাত্রার ধরন। শুধু লোকায়ত, স্থানিক ও বাংলা সংস্কৃতিময় জীবন নয়, তাদের সন্তান-সন্ততির জীবনযাত্রার সুবাদে আন্তর্জাতিক সন হিসেবে রোমান ক্যালেন্ডারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে গ্রামগঞ্জে। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও এটা সম্ভব ছিল না। এখন সে বাংলা আর নেই। এতে পরিবর্তনের গতি দ্রুততর হয়েছে। রাস্তাঘাট, ব্রিজ কালভার্ট হওয়ায় যাতায়াতের বিপুল উন্নতি ঘটেছে। বাস চলাচল করছে নতুন নতুন রাস্তা দিয়ে। গ্রামে দিনের সংবাদপত্র পৌঁছে যাচ্ছে দুপুরের আগেই। যাত্রা, জারি-সারি ভাটিয়ালিতে মানুষের আকর্ষণ কমেছে। সে স্থান দখল করেছে টেলিভিশনের বাংলা ও হিন্দি সিনেমা, নাচগান। ভিসিআরেও চলছে ওইসব ধুমধাড়াক্কা সিনেমা। গ্রামবাংলায় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে বিশ্ব সংস্কৃতির নানা উপাদান ঢুকছে গ্রামে। বিদেশি শব্দ, পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার উপকরণ, জিন্সের প্যান্ট সবকিছুই গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। ফলে বাংলা, বাঙালিত্ব ও বাংলা সন এক প্রবল অভিঘাতের মুখে পড়েছে। গ্রামবাংলায় এসবের ব্যবহারও কমে যাচ্ছে। নানা নেতিবাচক প্রবণতা, এমনকি বেলেল্লাপনাও ঢুকে পড়েছে গ্রামবাংলায়। এত যে খুন-জখম, ধর্ষণ, মারপিট, অপহরণ এগুলো ধুমধাড়াক্কা ডিসিম ডিসিম মার্কা হিন্দি ও তার নকল বাংলা সিনেমার প্রভাব বলেই মনে হয়। মানুষ চটকদার বিদেশি প্রভাবে সহজেই বিভ্রান্ত হয়। স্বল্পশিক্ষিত ও সাংস্কৃতিকভাবে অনিকেত মানুষ বিদেশি ভাল জিনিস নয়, খারাপটাই বেশি গ্রহণ করে। এ অবস্থায় বাংলা সন ও তার সংস্কৃতি পেরে উঠছে না। 'লারেলাপ্পা' মার্কা সংস্কৃতি বাজার মাত করছে। উনবিংশ ও বিংশ শতকে ইংরেজ শাসনের প্রভাবে নগরবাসী শিক্ষিত বাঙালি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে গ্রহণ করে বাংলা ও তার সংস্কৃতিকে অনেকটাই ভুলেছিল। তারা বাংলা সনের দিন তারিখ ভুলে আন্তর্জাতিক রোমান সনে অভ্যস্ত হয়েছিল। তবে গ্রামবাংলায় কলকাতা থেকে বাংলা পঞ্জিকা আসত। তার চাহিদা ছিল বিপুল। এখন গ্রাম বাংলায় ঘরে ঘরে বাংলা পঞ্জিকা নেই। কৃচিৎ কখনও কৃষি ব্যাংক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্যালেন্ডারে বাংলা তারিখ দেখি। গ্রামবাংলায় নতুন শিক্ষিত শ্রেণি বাংলা নয়, রোমান ক্যালেন্ডার বা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ব্যবহার শুরু করেছে। গ্রামীণ উৎসব-অনুষ্ঠান, বিয়ে-শাদি ও বিচার-সালিসের তারিখেও এখন রোমান ক্যালেন্ডারের তারিখ দেখা যায়। আগের মতো বাঙালি কায়দায় দাওয়াত, নিমন্ত্রণ, জিয়াফত ও বিয়ে-শাদিতে খড়ের বিছানায় বা শতরঞ্জিতে বসে খাওয়া-দাওয়ার চল ওঠে যাচ্ছে–এসেছে শহরের মতোই প্যান্ডেল ও টেবিল-চেয়ারের সংস্কৃতি।

গ্রামবাংলার নববর্ষ উদ্‌যাপনের ধারায়ও পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন আর আগের মতো ব্যাপক আকারে গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, লাঠি বা হা-ডু-ডু খেলা দেখা যায় না–হলেও কদাচিত হয়। ফলে গ্রামবাংলায় এখন ক্রান্তিকালের সংস্কৃতি-শূন্যতা চলছে।

নববর্ষ : ঐতিহ্যের নবায়নে নাগরিক উৎসব শিল্প বিপ্লবের পর ইউরোপে যখন পুঁজিবাদী অর্থনীতি, জাতি-রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র এবং নতুন নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠল, তখন তাদের মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যানুসন্ধান প্রবণতাও তীব্র হয়ে ওঠে। জার্মানিতে ইয়োহান হার্ডার, গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় এবং দার্শনিক কান্ট মাতৃভাষা চর্চা ও লোকজ ঐতিহ্য উদ্ধার করে নতুন জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণে ব্রতী হন। ইংল্যান্ডে উইলিয়াম থমস 'ফোকলোর' শব্দ উদ্ভাবন করে নতুন নাগরিক শিক্ষিত সমাজকে ঐতিহ্যসচেতন ও শিকড়সন্ধানী করে তোলেন। ফিনল্যান্ডে গ্রাম-ডাক্তার এলিয়াস লনরুট লোক মহাকাব্য কালেভেলাকে আবিষ্কার করে গড়ে তোলেন নতুন ঐতিহ্যপ্রেমিক নাগরিক মধ্যবিত্ত।

আমাদের পূর্ববাংলায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর ইউরোপের মতোই নতুন করে শিকড় অনুসন্ধান প্রবণতা শুরু হয়। পূর্ববাংলার নবজাগ্রত নগরবাসী বাঙালি মুসলমান সমাজ বাঙালি জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্যকে সামনে আনে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও স্বৈরশাসকদের বাঙালির স্বার্থ ও অধিকারকে নির্মমভাবে দমন করার বিরুদ্ধে বাঙালির রাজনৈতিক সংগ্রামে যুক্ত হয় সংস্কৃতির বিস্ফোরক উপাদান। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে অন্য সাংস্কৃতিক উপাদানের মতো বাংলা নববর্ষের উৎসব-অনুষ্ঠান লোকাচারও হয়ে ওঠে এক শক্তিশালী হাতিয়ার। ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলায় যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় ও মুসলিম লীগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর এ কে ফজলুল হক পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বাংলা নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করেন। ১৯৫৪ সালে ৯২-ক ধারা জারি করে পাক দুর্বৃত্ত শাসকরা বাংলা নববর্ষের ছুটি বাতিল করে। এতসব করেও বাঙালির অপ্রতিরোধ্য বিজয় ঠেকাতে না পেরে সামরিক শাসক আইয়ুব ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে বাঙালির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামী আন্দোলনকে সাময়িকভাবে রুখে দেন। কিন্তু পাক মাথা-মোটা শাসকরা সংস্কৃতির, বিশেষ করে রাজনীতি ও সংস্কৃতির মিলিত শক্তির গভীরতা বুঝতে অক্ষম হয়। তাই তারা বিগত শতকের '৬৭ সালে রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করে বাংলার ঘুমন্ত বাঘকে জাগিয়ে তোলে। এর ফলে বাঙালির জাতি গঠনের সংগ্রামে বাংলা নববর্ষের উৎসব হয়ে ওঠে নতুন এক বীজমন্ত্র। কারণ নৃ-তাত্ত্বিক জাতি গঠনে যে ধরনের উপাদান প্রয়োজন বাংলা নববর্ষের উৎসব অনুষ্ঠানে তা ভালমতোই আছে। তাই ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বাংলা নববর্ষ উৎসব বা পয়লা বৈশাখ হয়ে ওঠে বাঙালির সম্ভাব্য মহান এক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় উৎসব।

এমন একটি দিনের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল দারুণভাবে। গ্রামবাংলার এককালের ক্ষুদ্র, সামান্য, লোকাচারভিত্তিক আঞ্চলিক ও বিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠান থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয় বাঙালির নববর্ষকে এক বিরাট ও ব্যাপক জাতীয় উৎসব হিসেবে। এ উৎসবের মধ্যে বাঙালিত্বের চেতনা যেমন তীব্রতা লাভ করে, তেমনি হয়ে ওঠে প্রতিবাদের প্রতীক এক অনন্য অনুষ্ঠান। সেজন্যই পাকিস্তানি শাসক-শোষকরা হামলে পড়ে এই বাঙালির নবচেতনার প্রতীক উৎসবের ওপর। মূর্খ মোল্লা-মৌলবিরাও এর বিরোধিতা করে। তবে পূর্ববাংলার জাগ্রত বাঙালি তখন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবল তোড়ে ভাসিয়ে দেয় কাঠমোল্লা আর পাকশাসকদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে। বৈশাখী উৎসব বা বাংলা নববর্ষের উৎসবের এ নাগরিক উত্থানের প্রধান কৃতিত্ব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ছায়ানটের'। এ প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে রমনার বটমূলে বাঙালি পহেলা বৈশাখের উৎসবে এক নবমাত্রা যোগ করে। ১৯৬৭ সালে শুরু হওয়া এ উৎসব নিয়েই অতিক্রম করতে থাকে এক বছর থেকে অন্য বছরে বিশালতায়, সর্বশ্রেণির লাখো মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত, উদ্দীপনাপূর্ণ এবং অঙ্গীকারদীপ্ত উপস্থিতিতে।

স্বাধীনতার পর বাঙালি তার গ্রামীণ জীবনযাত্রার অনুষঙ্গী বৈশাখী উৎসবের ক্ষীয়মাণতাকে নবপ্রাণদান করে রাজধানী শহরে ভিন্ন আঙ্গিকে, আধুনিক বিন্যাসে উপস্থাপন করে। ১৯৮৯ থেকে এ উৎসবে চারুকলার ছাত্রদের মুখোশ, নানা কার্টুন চিত্র ও বর্ণাঢ্য মিছিল এক নতুনমাত্রা ও প্রতিবাদী ব্যঞ্জনা দান করে। দুঃশাসন, স্বৈরাচার এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে এ বিশাল উৎসব বহু বার্তা প্রদান করে। সেজন্যই বুঝি ইসলামি জঙ্গিরা এ উৎসবে বোমা মেরে তাদের পশু মানসিকতার পরিচয় চিহ্নিত করে।

গ্রামীণ বাংলা নববর্ষ উৎসব ক্ষুদ্র, সাধারণ ও সামান্যতা নিয়ে নগরে আসে। এখন তা নগরে নতুন আঙ্গিকে বিশালভাবে বিন্যস্ত হয়ে নানা অর্থপূর্ণ ম্যাসেজ দিচ্ছে এবং প্রতিবছরই রাজধানীতে নতুন তাৎপর্যে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে এবং এখন ধীরে ধীরে শহর, গঞ্জ হয়ে নতুনরূপে আবার গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের দিকে যাচ্ছে। সংস্কৃতির এই চক্রমন ও প্রান্ত বদল আকর্ষণীয়। যে উৎসে এক সময়ে এর শুরু সেখানেই আবার ভিন্ন অবয়বে, আধুনিক শৈলীতে নতুন করে গড়ে উঠবে বাংলা নববর্ষের উৎসব।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

০১ বৈশাখ ১৪১৯
১৪ এপ্রিল ২০১২

বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে দেশবাসী, প্রবাসী বাঙালিসহ বিশ্বের সকল বাঙালি সংস্কৃতির অনুরাগীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভ নববর্ষ।

বাঙালি জাতির অন্যতম প্রধান উৎসব বাংলা নববর্ষ। এ দিন গোটা দেশ শাশ্বত ঐতিহ্যে লালিত বাঙালি সংস্কৃতির চারণভূমিতে পরিণত হয়। পহেলা বৈশাখের এ বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ-রস-গন্ধ আজ বাঙালির প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে। দেশ-বিদেশের বাঙালি ও বাংলাভাষাভাষী মানুষের কাছে এটি একটি মহাউৎসবের দিন।

নববর্ষ মানেই লোকায়ত বাঙালি সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য উৎসব। প্রাণে নতুন উদ্যম সঞ্চরণের প্রেরণা। নতুন আশায় উদ্দীপ্ত হওয়ার নির্ঘণ্ট।

বাংলা নববর্ষ বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক চেতনার আধার। এ চেতনাকে নস্যাৎ করার জন্য স্বাধীনতার আগে ও পরে বহু ষড়যন্ত্র হয়েছে। আঘাত করা হয়েছে বার বার। বোমা মেরে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক শক্তির কোনো অপচেষ্টাই সফল হয়নি। বাঙালি জাতি তার আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

আমি আশা করি, পহেলা বৈশাখে বাঙালি সংস্কৃতির এ চর্চা আমাদের জাতিসত্তাকে আরও বিকশিত করবে। আরও ঐক্যবদ্ধ করবে। আমাদেরকে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শক্তি যোগাবে।

জীর্ণ, জরা ও গ্লানি মুছে দিয়ে সকল বাঙালির জীবনে ১৪১৯ সন সুখ, সমৃদ্ধি ও অনাবিল আনন্দ বয়ে আনুক–এই প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

এডভোকেট প্রমোদ মানকিন, এম.পি.
প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ পহেলা বৈশাখ। বাংলাদেশের মানুষের নিজেদের উদ্‌ঘাটিত করার এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এ দিনে সকলকে আমার বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই।

বাংলাদেশের অন্যতম সার্বজনীন উৎসব পহেলা বৈশাখ। পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষবরণ বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য আর এইদিন বর্তমানে উৎসবের অংশ রূপে পরিগণিত। বাঙালি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা থেকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেতনার উন্মেষ। যার অনিবার্য পরিণতি আজকের স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক শুভ কামনা ও আনন্দময় সামাজিক যোগাযোগ ঘটে থাকে। আমরা বর্ষবরণকে ঘিরেই ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে এক বৃহত্তর জীবন-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হই। বাংলা নববর্ষ উৎসব শুধু যে পহেলা বৈশাখের মাঝেই সীমাবদ্ধ তা নয়, চৈত্র সংক্রান্তির মধ্য দিয়ে পুরনো বর্ষের বিদায়ও একই সূত্রে গ্রথিত। চৈত্র সংক্রান্তির মধ্য দিয়ে যেমন বিগত দিনের সকল জীর্ণতা ও মলিনতাকে বিদায় দেওয়া হয়, তেমনি পহেলা বৈশাখে আমরা আবাহন করি শাশ্বত সত্য, সুন্দরের ও নতুনের।

বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক গ্রাম-সমাজের লোকজ ধর্ম, ধর্মীয় অনুশাসনের শিথিলতা এবং উদার মানসিকতা ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাবই বাংলা নববর্ষকে গণমানসে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সার্বজনীন করে তুলেছে।

বাংলা নববর্ষ ১৪১৯ সাল সকলের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, আনন্দ ও সমৃদ্ধি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এডভোকেট প্রমোদ মানকিন এম.পি.)

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলা নববর্ষ বাঙালি জাতিসত্তা ও সংস্কৃতির নিজস্বতা-জ্ঞাপক অন্যতম উৎসব। পাশ্চাত্য বা পারস্যে যেমন নিউ ইয়ার্স ডে, নওরোজ তেমনি বাংলায় পহেলা বৈশাখ। এককালে বাংলা সনের শুরুর দিন পহেলা বৈশাখ মুখ্যত ছিল ফসলকেন্দ্রিক। কালিক বিবর্তনে তা বাঙালি জীবনের বৃহত্তর পরিসরকে ধারণ করে হয়ে ওঠেছে এক সার্বজনীন উৎসবের মাহেন্দ্রমুহূর্ত। বলা চলে আবহমান বাঙালির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনকেই শুধু বাংলা সন সবল ও সক্রিয় করেনি, তার নিজস্ব ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনবৃত্তের মধ্যে থেকে তার বিশ্বদৃষ্টি গঠনে বাংলা সন-নির্ভর সাংস্কৃতিক, দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তবে বাংলা সনভিত্তিক বাঙালির নিজস্ব নববর্ষ উৎসবকেও পাড়ি দিতে হয়েছে অবিশ্বাস্য প্রতিরোধের পথ। বৈরিতার ভেতর দিয়েই পহেলা বৈশাখের নববর্ষ উৎসব পেয়েছে নবতর বিকাশের গতিপথ। তাই আমরা দেখি ছায়ানটের উদ্যোগে রমনা বটমূলে বর্ষবরণ উৎসব এবং চারুকলা ইন্সটিটিউট প্রাঙ্গণে মঙ্গল-শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে কুপমণ্ডুকতা-সাম্প্রদায়িকতা-অন্ধতার বিরুদ্ধে বাঙালির সমন্বয়বাদী-উদার-অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। পৃথিবীর আর কোনো নববর্ষ উৎসব এভাবে জাতিত্বের এতোটা সমার্থক হয়ে ওঠেছে বলে আমাদের জানা নেই। পহেলা বৈশাখের তাৎপর্য এখানেই।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেমন কালবৈশাখীর ঝড়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন নতুন দিনের বার্তা তেমনি আমরাও মনে করি বিগত বছরের সকল ব্যর্থতা, গ্লানি, দ্বিধা বৈশাখী ঝড়ের হাওয়ায় দূর হয়ে যাবে। এবারের নববর্ষে অনাবিল শান্তি, অফুরান আনন্দ আর অশেষ সমৃদ্ধির বাংলাদেশ বিনির্মাণই হোক আমাদের প্রত্যয়। শুভ নববর্ষ ১৪১৯।

০৫.০৪.১২
(সুরাইয়া বেগম, এনডিসি)

পয়লা বৈশাখ ও আমাদের সংস্কৃতি

আহমদ রফিক

পয়লা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা নববর্ষ বাঙালিয়ানার ঐতিহ্য ধারায় আমাদের সাংস্কৃতিক আবেগের প্রকাশ ঘটায়। সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম প্রধান এ অনুষ্ঠান প্রধানত উৎসব হিসাবে উদ্‌যাপিত, এবং তা দীর্ঘকাল থেকে। রাজধানী ঢাকায় নাগরিক নববর্ষের জমকালো উদ্‌যাপন সাম্প্রতিক হলেও গ্রাম বাংলার জীবন যাত্রায় নববর্ষের উৎসব সময় বিচারে প্রাচীন। কিন্তু এর দূর-প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তথ্য আমাদের হাতে নেই।

সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদির পুরাতাত্ত্বিক বিচার ব্যাখ্যায় অনুমান করা হয় যে প্রাগৈতিহাসিক অতীতে এ অঞ্চলে বসবাসরত অষ্ট্রিকভাষী কৃষিজীবী প্রাচীন জনগোষ্ঠীর কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নববর্ষ হয়তো ফসলের সময় হিসাবে উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। এমন অনুমানের সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি আদিম জনগোষ্ঠীর উৎসব-অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য যা এখনো আদিবাসী সমাজে দেখতে পাওয়া যায়।

সময় ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারায় পরবর্তীকালে এসব অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার বা রীতিনীতির প্রভাব পড়েছে। আবার দীর্ঘসময় পর আধুনিকতার টানে ধর্মীয় প্রভাবের পরিবর্তে সর্বজনীন বিনোদনের দিকটাই প্রধান হয়ে থেকেছে। আবারও উদাহরণ হিসাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা চলে।

সময়ের নিরস হিসাবে দেখা যায় মানব সংস্কৃতিতে নববর্ষ উৎসবের সরস ঐতিহাসিক সূচনা আজ থেকে চার হাজার বছরেরও আগে। এর প্রাগৈতিহাসিক অনুষ্ঠান ধরে নেওয়া যায় আরো আগে। বিশদ বিবরণে না যেয়ে উল্লেখ করা চলে বেবিলনীয়, আসিরীয়, মিশরীয়, ইরানি, চৈনিক ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে নববর্ষ অনুষ্ঠানের কথা। ইউরোপীয় নববর্ষের সময়বৈচিত্রের ইতিকথাও উল্লেখযোগ্য। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে গ্রীস রোম হয়ে পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন বিন্দুতে নববর্ষের সানন্দ আঁকিবুঁকি।

নববর্ষের উৎসব-উদ্‌যাপন সম্পর্কে উল্লিখিত একটা সাধারণ সূত্র বুঝে নেবার পরও সঠিকভাবে বলা চলে না কবে থেকে আমাদের বঙ্গীয় ভূখণ্ডে বর্ষ শুরুর কোন্ মাস ধরে নববর্ষ উদ্‌যাপন শুরু। আদি সূচনা জানা না গেলেও ফসলের মাস প্রাচীন অগ্রহায়ণ বর্ষ শুরুর মাস হিসাবে স্বীকৃত। অগ্রহায়ণ শব্দটির মূলগত অর্থ থেকে তা স্পষ্ট। অঘ্রানে নতুন চালের পিঠা-পায়েসের স্বাদে-গন্ধে উৎসবের যোগসূত্র যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

বিশেষ করে তা আরো স্পষ্ট হয় এ অঞ্চলের আদি কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর ভূমিনির্ভর জীবনাচরণ, প্রকৃতি উপাসনা ও সংশ্লিষ্ট আচার আচরণের ঐতিহ্য-অবশেষ বিচার করে দেখলে। সংস্কৃতির ঐ দিকচিহ্নগুলো, যেমন-শব্দের ব্যবহার, গণনারীতি, খাদ্যাভ্যাস ও সামাজিক অনুষ্ঠানের কিছু রীতি গ্রামীণ জীবনে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন- ধানদূর্বা, পান-সুপারি, আল্পনা থেকে লোকশিল্প, কুটিরশিল্প সামগ্রীর বাহারি রূপে যে ঐতিহ্যের প্রকাশ।

মানতেই হবে যে আমাদের গ্রাম, গ্রামীণ জীবনই এদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে যা অর্থনৈতিক কারণে সৃষ্ট সামাজিক দুরবস্থায় এখন কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। ধানদূর্বা, পানসুপারি, কলা থেকে কৃষি সংস্কৃতির বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান গ্রামের সামাজিক স্তরে বেঁচে থাকলেও নৌকাবাইচের মতো অনেক কিছুই লুপ্ত। তবে দোতরা-একতারায় লোকগীতির নানা শাখার প্রকাশ এখন নতুন করে উজ্জীবিত হতে শুরু করেছে। এবং ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়ার সুরের টান এখন প্রধানত শহরে নব্যসংস্কৃতিচর্চার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে একটি বিষয় সত্য যে বাংলা দিনপঞ্জি ও বাংলা সন তারিখের ব্যবহার এখন বাংলার গ্রামীণ সমাজই ধরে রেখেছে, নাগরিক সমাজে তা পরিত্যক্ত, ঐতিহ্য হিসাবেও নগর তা গ্রহণ করছে না এবং সেটা আধুনিকতা ও আন্তর্জাতিকতার অজুহাতে।

আধুনিক যুগে পৌঁছে আমরা দেখছি রুদ্র বৈশাখের শুরুতে নববর্ষের অনুষ্ঠান। সে অনুষ্ঠান-উৎসবেরও মূল কেন্দ্র বাংলার গ্রাম। কিন্তু কবে থেকে শুরু, কীভাবে শুরু তা নিয়ে বিতর্ক এখনো শেষ হয়নি। সেসব বিতর্কবিচার বাদ দিয়ে সংখ্যাগুরু অভিমতটাই নেওয়া যাক যে মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে বৈশাখী বঙ্গাব্দের সূচনা। এবং চমৎকার আবহাওয়ার মাস অঘ্রানের বদলে তপ্ত-গুমোটের বৈশাখে আমাদের নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠান।

এ উপলক্ষে বাংলার গ্রামে গ্রামে দীর্ঘকাল ধরে চলছে সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম প্রকাশ বাংলা নববর্ষ হিসাবে পয়লা বৈশাখের আনন্দময় উৎসব অনুষ্ঠান বৈশাখী মেলা। রীতিমত জমজমাট মেলা প্রধানত অশথবটের ছায়ায়। গ্রামে তখনো বৃক্ষনিধনের তাণ্ডব শুরু হয়নি। তাই গাছের ছায়ায় দোকানিদের রকমারি বিকিকিনির পসরা সাজিয়ে বসা। বিনোদন ও প্রয়োজন দুরকম চাহিদাই মেটে এসব মেলায়।

তাছাড়া রয়েছে প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের ঐতিহ্য। রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ সংস্কৃতির এই বিশেষ দিকটির প্রতি নানা কারণে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লিখেছেনও এ বিষয়ে। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে দেশের সামাজিক - সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বিচারে শুধু গ্রামেই নয় এবং পয়লা বৈশাখেই নয়, জেলায় জেলায় শহরে শহরে নানা উপলক্ষে এ ধরনের মেলা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে চিত্ত বিনিময়ের মাধ্যম হতে পারে। তৈরি করতে পারে সহমর্মিতা ও ঐক্যবোধের পরিবেশ।

রবীন্দ্রনাথ একসময়, বিশেষ করে শিলাইদহ অঞ্চলে বসবাসের সময় লোকসংস্কৃতির অনুরাগী হয়ে ওঠেন। শুধু বাউল গান বা লোকসঙ্গীতই নয়, গ্রামীণ সমাজের আধুনিকায়নের স্বার্থে লোকসংস্কৃতির উজ্জীবনে উৎসাহী হয়ে ওঠে। শুভ নববর্ষ সেসবের একটি। তার বিশ্বাস ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির উজ্জীবন ও আধুনিকায়ন জাতীয় জীবনের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে গ্রাম- নগরের যোগাযোগেও আগ্রহী ছিলেন তিনি। দেশ বলতে রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাংলাকেই বুঝতেন এবং সেকথা লিখেছেন একাধিক প্রবন্ধে, বিশেষ করে গ্রাম-উন্নয়ন ও পল্লিপুনর্গঠন কর্মকাণ্ড উপলক্ষে।

রবীন্দ্র-শতক পেরিয়ে বর্তমান শতকের আধুনিকতায় পৌঁছেও রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন (আমাদের স্বপ্ন) 'গ্রামগুলো জেগে উঠুক, সুস্থ সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক, অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠুক' বড় একটা সত্য হয়ে ওঠেনি যদিও গ্রামের অবস্থা আগের তুলনায় ভালো এমন দাবি আমরা করে থাকি। পাশাপাশি একথা সত্য যে স্বাধীন বাংলাদেশে নগরবাসী একটি বিশেষ শ্রেণিকে সোনায় মুড়ে রেখেছে, কিন্তু তার প্রতিফলন যে গ্রামাঞ্চলে নেই এ সত্য না মেনে উপায় নেই।

গ্রামীণ সংস্কৃতিচর্চা এখন তার মজা খালের মতোই, পয়লা বৈশাখের উৎসব-অনুষ্ঠানেরও একই পরিণতি, সরেজমিন বাস্তবতা তাই বলে। আর রাজধানী ঢাকার আশপাশে তাকালে ঠিকই বুঝতে পারা যায় যে ক্রমান্বয়ে গ্রাম উঠে আসছে নগরে-বন্দরে, বিশেষত রাজধানী ঢাকার বস্তি অঞ্চলে। সেটা জীবনযাপনের তাগিদে। অন্যদিকে গ্রামীণ সংস্কৃতির কিছু দিক ভালোভাবে জায়গা করে নিয়েছে রাজধানী মহানগরে। এর সর্বোত্তম প্রকাশ পয়লা বৈশাখের দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য উদযাপনে।

আমাদের সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রকাশ নগর-বন্দরে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে অনেক বাধা বিপত্তি পার হয়ে। বাঙালি মুসলমানের ভোটের জোরে স্বতন্ত্র ভুবন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও তখনকার প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিচর্চা পাকিস্তানি শাসনের বিরূপতায় ও বাঙালি রক্ষণশীলতার চাপে ব্যাহত হয়েছে। পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান তখন উৎসবের গরিমা অর্জন করেনি। রবীন্দ্রজন্মোৎসব সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। খণ্ডিত নজরুল তথা অর্ধেক নজরুল ছিলেন জলচল।

ঢাকায় পয়লা বৈশাখ ঐ প্রতিকূল আবহে তবু পালিত হতে দেখা গেছে কিছু সংখ্যক সংস্কৃতিবান পরিবারে গীতবাদ্য ও দই-মিষ্টি সহযোগে। জাতীয় পর্যায়ে এর প্রকাশ বড় একটা দেখা যায়নি পাকিস্তানি জোশের কারণে। তবু দু'একটি সাহসী, প্রগতিশীল সংগঠন চেষ্টা করেছে বাঙালি সংস্কৃতির জীর্ণ ধারাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে। যেমন ১৯৫১ সালে ঢাকায় 'লেখক শিল্পী মজলিশ' রীতিমত আমন্ত্রণপত্র ছেপে পয়লা বৈশাখের উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সে অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীত এবং ঢাকা বেতারের স্বনামখ্যাত কয়েকজন শিল্পী সাহস করে তাতে অংশ নিয়েছিলেন। অবস্থা তখন এমনই ছিল।

সত্যি বলতে কি বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। যেমন ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় তেমনি রাজনীতির গণতান্ত্রিক চর্চায়। তার প্রমাণ যেমন গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা পরবর্তী ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং প্রায় দুবছর পর গণতন্ত্রী যুক্তফ্রন্টের একচেটিয়া বিজয় ও মন্ত্রীসভা গঠনে তেমনি ১৯৫২ সালের আগস্টে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনের লোকচরিত্রে ও প্রগতিধর্মে। লোকগীতি ও কবিগানের আধুনিকতার আলোচনায় সেখানে বাঙালিয়ানার ঐতিহ্যিক প্রকাশ ঘটে।

বায়ান্নর জোয়ারে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যে পলিসঞ্চার তার প্রভাবে ১৯৫৪ সালে সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন এবং বাংলা নববর্ষের উৎসাহী আয়োজন যেমন ঢাকায় তেমনি বিশেষ বিশেষ জেলা শহরে। 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'-এর সভাপতি ড.কাজী মোতাহার হোসেন সেবার বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে পয়লা বৈশাখ সরকারি ছুটির দিন ঘোষণার দাবি জানিয়েছিলেন। আর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার প্রধান (মুখ্যমন্ত্রী) এ.কে.ফজলুল হক পয়লা বৈশাখে মননশীল ও জাতীয়তাবাদী চরিত্রের ভাষণ দিয়ে ছিলেন জাতির প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে।

সত্যি ১৯৫৪ সাল চার/পাঁচ মাসের জন্য হলেও বাঙালি জাতি ও বাঙালি সংস্কৃতিচর্চার জন্য একটি সুস্থ, সুষ্ঠ দিক নির্দেশনা দিতে পেরেছিল। সংস্কৃতিচর্চার প্রতিটি অঙ্গন ছিল অনুষ্ঠানমুখর। আর 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ', 'পূর্ববঙ্গ লেখক সংঘ', 'পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ', 'আজিমপুর ছাত্র সংঘ'সহ ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস ও একাধিক সাংস্কৃতিক সংগঠন সে বছর মহাসমারোহে ঐতিহ্যবাহী পয়লা বৈশাখ অর্থাৎ শুভ নববর্ষ উদ্‌যাপনের বর্ণাঢ্য আয়োজন করে।

কিন্তু পাকিস্তানি বাধা তখনো শেষ হয়নি যেমন রাজনীতিতে তেমনি সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে। তাই ১৯৫৪ সালের ৩০মে পতন ঘটানো হয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার। জারি করা হয় পূর্ববঙ্গে গভর্নর ইস্কান্দার মীর্জার শাসন। চলে ব্যাপক হারে গ্রেফতার। কিন্তু বায়ান্নর ধারাবাহিকতায় ১৯৫৩ সাল থেকে সেই যে শহীদ দিবস উদ্‌যাপন, একুশে সংকলন (যেমন- হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী') ও একুশে-সাহিত্যের প্রকাশ, ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা সে ধারা ক্রমেই বেগবান হয়েছে। এর পরিশীলিত রূপ ক্রমশ সংস্কৃতিচর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে। শহীদ মিনার চত্বরে ও রাজপথে রঙিন আল্পনা আঁকায় বাধা থাকেনা।

পঞ্চাশ থেকে গোটা ষাটের দশক জুড়ে সংস্কৃতিচর্চার জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিবাদী দুটো ধারা মিলিত স্রোতে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করেছে। বাঙালি জাতীয়তার চেতনা ঐ ধারায় ক্রমশ বিকশিত হয়েছে। 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই' কাব্যপঙক্তিটিকে সত্য প্রমাণ করেছে ষাটের দশকের সংস্কৃতিচর্চা। নববর্ষ উদ্‌যাপন সঠিক ভাবে চলেছে, কিন্তু বাধা এসেছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সরকারি প্রচার ও পরিবেশনায়। সে বাধা থেকে উত্তরণ ঘটেছে বেসরকারি খাতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চাপে।

এ পর্বের সংস্কৃতিচর্চায় শাসক-বিরোধী প্রতিবাদের প্রকাশ ঘটিয়ে সঙ্গীত, নাটক, বিশেষ করে গণসঙ্গীতের চর্চা ও পরিবেশন। তবে প্রতিবাদী সংস্কৃতির এ ধারায় রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ (১৯৬১) উদ্‌যাপন যেমন একটি মাইলফলক, তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ রমনার অশথ ছায়ায় প্রতিবছর মহা ঘটা করে পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন, সেই সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠীর ঘরে-বাইরে গানে-কবিতায়, নাট্য পরিবেশনায় শুভ নববর্ষ পালন নয়া ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। একই ভাবে অনুষ্ঠিত হয় পঁচিশে বৈশাখ ও ১১ই জ্যৈষ্ঠ।

এ ধারা যেমন রাজনৈতিক আন্দোলন ও একাত্তরের সংগ্রামী ধারা উজ্জীবিত করেছে তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশে ঘটেছে একই রকম সংস্কৃতিচর্চার ব্যাপক প্রকাশ, গুণগত প্রসার। রাজধানী ঢাকায় পয়লা বৈশাখের উদ্‌যাপন এমন ব্যাপক ও বর্ণময়, এমন রূপময় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয় যে বাংলা নববর্ষ হয়ে উঠেছে চরিত্রগুণে জাতীয় অনুষ্ঠান। একে জাতীয় উৎসবের দিন হিসাবে ঘোষণা করা উচিত। ঢাকায় নববর্ষের মেলায় শিল্পসম্ভারের উপস্থিতি ও বিকিকিনি এর সাংস্কৃতিক রূপকে বিশেষ উচ্চতায় পৌছে দিয়েছে। বৈশাখী উৎসব নিজেই যেন একটি বৃহৎ ক্যানভাস, বর্ণময় চিত্রকর্ম। সময় এতে ক্রমান্বয়ে রঙ বুলিয়ে চলেছে। তাতে যেমন যোগ দিচ্ছে রাজনৈতিক কর্মী, সংস্কৃতিসেবী তেমন চারুকলার কারিগরগণ, সর্বোপরি সঙ্গীতশিল্পী সবাই মিলে, সবাইকে নিয়ে পয়লা বৈশাখের বর্ণাঢ্য শুভযাত্রা। সাংস্কৃতিক পদযাত্রায় একটি আনন্দময় দিন যাপন।